Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দুই মৃণাল : রবীন্দ্র-বিতর্কের এক অনালোচিত অধ্যায়

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Soumitra Sekhar
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).5
Pages	৮৭-৯৭
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

দুই মৃণাল : রবীন্দ্র-বিতর্কের এক অনালোচিত অধ্যায়

Check for updates

সৌমিত্র শেখর*

মৃণাল দুজন! বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে বাংলা কথাসাহিত্যের পাঠকসমীপে চরিত্র হিসেবে মৃণালের কথা তুললেই তারা বলবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পের মৃণাল আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *গৃহদাহ* উপন্যাসের মৃণাল প্রসঙ্গ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী ভবতারিণীর নাম পাল্টে রেখেছিলেন মৃণালিনী দেবী, সেটাও অনেকের জানা। মৃণাল শব্দের আভিধানিক অর্থ পদ্মের ডাঁটা। এই ডাঁটাই অনিন্দ্যসুন্দর পদ্মফুলকে ধারণ করে থাকে, জাগিয়ে রাখে জলসমতল থেকে নান্দনিক দূরত্বে। অর্থাৎ মৃণালকে ভার বহন করতে হয় পদ্মের, নিরংকুশ করতে হয় পদ্ম-সৌন্দর্যের। তাই হয়তো পুত্র বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনে পিতা রাবণের মনের অবস্থা বোঝাতে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর *মেঘনাদবধ কাব্যে* একটি সুন্দর চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন মৃণালের সহযোগে :

> হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
> তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
> ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
> যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি। (বিষ্ণু, ১৯৮৭ : ৩৭)

মধুসূদনের এই চমৎকার চিত্রকল্প স্মরণে রেখেই বলতে হয়, মৃণালের গায়ে থাকে কাঁটা। এই কণ্টক প্রকৃতিই তাকে দিয়েছে— আত্মরক্ষার কাজে, হয়তো পদ্মের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও। শরৎচন্দ্র তাঁর *গৃহদাহ* উপন্যাসে দেখিয়েছেন, মৃণাল চরিত্র শেষ অবধি নিজেই রক্ষা করে নিজেকে। তাই এই চরিত্রের ওপরই ঔপন্যাসিক অর্পণ করেছেন সমাজগতির নির্দেশনা। সংস্কারপ্রবণ বিধবা হলেও ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে মৃণাল 'তীক্ষ্ণদৃষ্টি রমণী'। উপন্যাসের প্রান্তিকে মহিমের শেষ আশ্রয়স্থল এই মৃণাল। মহিম মৃণালকে বলেছে : 'অচলা আমাকে একটা আশ্রয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল মৃণাল, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারি নি। তোমার কাছে হয়ত সে একটা উত্তর পেতেও পারে।' (শরৎ, ১৯৯৯ : ৪৬৬)। শরৎচন্দ্রের মৃণাল এভাবেই ঔপন্যাসিকের প্রার্থিত সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' ছোটগল্পের মৃণাল সাহসী নারীর প্রতিনিধি হয়ে ছিন্ন করেছিল সমাজ আর সংসারের বন্ধন। শরৎচন্দ্রের মৃণালের কাজটি সে সময় ও সমাজে স্বাভাবিক ছিল; রবীন্দ্রনাথের মৃণালের কাজটি স্বাভাবিক ছিল না। তাই রবীন্দ্রনাথের মৃণালের এই কর্মকে প্রশ্ন করেছিলেন তৎকালে অনেকে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপিনচন্দ্র পালও ছিলেন এই প্রশ্নকারীদের মধ্যে।

ক.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু কাজ ও লেখার কারণে সমকালেই অনেকে তাঁর সমালোচনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরও রবীন্দ্র-বিতর্ক ছিল। একালেও এই বিতর্ক একেবারে শেষ হয়ে

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গেছে, তা বলা যাবে না। এ বিতর্কসমূহ রবীন্দ্র-গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সমাদৃত। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে (কার্তিক, ১৩২০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পাবার অল্প কিছু দিন পর প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় *সবুজপত্র* (বৈশাখ, ১৩২১) পত্রিকা প্রকাশ পায়। *সবুজপত্র*-এর প্রতিটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা ছিল। *সবুজপত্র* প্রকাশের আগে প্রমথ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ কথাই দিয়েছিলেন যে, তিনি ওই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখবেন। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় *সবুজপত্র*-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন :

তখন আমার আয়ুর তরণী
যৌবনের ঘাট গেছে পেরিয়ে।
যে সব কাজ প্রাচীনকে প্রাজ্ঞকে মানায়
তাই নিয়ে পাকা করছিলেম
পাকা চুলের মর্যাদা।
এমন সময় আমাকে ডাক দিলে
তোমার সবুজপত্রের আসরে।
আমার প্রাণে এনে দিলে পিছুডাক,
খবর দিলে,
নবীনের দরবারে আমার ছুটি মেলে নি।
দ্বিধার মধ্যে মুখ ফিরালেম
পেরিয়ে আসা পিছনের দিকে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৪ : ৫৯)

সবুজপত্র প্রকাশের কয়েক মাস পরই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় *নারায়ণ* (অগ্রহায়ণ, ১৩২১) পত্রিকা প্রকাশ পায়। চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যক্তি-জীবনে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, রাজনীতিতে সমন্বয়বাদী, সাময়িকী সম্পাদনায় উদার। এই গুণসমূহের বিস্তার লক্ষ করা যায় *নারায়ণ* পত্রিকায়। *নারায়ণ*-এর সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন চিত্তরঞ্জন-ভ্রাতা সুকুমাররঞ্জন দাশ। কলকাতার কালিঘাটস্থ ১৪৮ নম্বর রসা রোড থেকে রমেশচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ও বিজয়া প্রেসে (২০নং পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা) মুদ্রিত হতো *নারায়ণ*। *নারায়ণ* 'মাসিকপত্র ও সমালোচন' হিসেবে দীর্ঘ আট বছর নিয়মিতভাবে বের হয়। বাঙালির জীবন, রাজনীতি ও সাহিত্যে এই পত্রিকার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া কম ছিল না। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতাসংগ্রাম সম্পর্কে ভারতবাসী বিশেষত বাঙালিদের মতবাদগত অবস্থান, বাংলা সাহিত্যে রীতি-নীতির প্রশ্নে পাশ্চাত্য না ভারতীয় কলাবিদ্যা অনুসরণ, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চা কতটা জাতীয় স্বার্থ-সহায়ক ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে *নারায়ণ* পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ শতকের বিশের দশকে রবীন্দ্র-বিতর্ক ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক বিষয়। *নারায়ণ* পত্রিকাও এই বিতর্কে অংশ নিয়েছিল এবং বলা চলে রবীন্দ্র-বিতর্ক পত্রিকাটির অন্যতম প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। পত্রিকাটির ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকেই এই বিতর্কে অংশ নিতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের কথিত পাশ্চাত্য-প্রভাবিত সাহিত্যাদর্শ, ব্রিটিশ ও ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে মনোভাব ও অবস্থান ইত্যাদি প্রশ্নে *নারায়ণ* পত্রিকায় বিতর্কমূলক লেখা প্রকাশিত হয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য সরাসরি এই মন্তব্য করেছেন: 'সবুজপত্র ও বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজের সকল

প্রকার কর্মকে নিন্দিত করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন দাশের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ সাহিত্যিকদের অনুকূলতায় নারায়ণ নামে মাসিকপত্রের আবির্ভাব হইল।' (প্রভাত, ১৯৯২, ৪৬৫) এই বিরোধিতা যে ব্যক্তিগত ছিল না, বরং ছিল আদর্শগত প্রভাতকুমার সে কথা উল্লেখ করেন নি। আদর্শের জায়গাটি হলো, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ব্রিটিশবিরোধিতা ও স্বদেশীপনা বাংলা সাহিত্যের বিষয় ও রূপকলাতেও দেখতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যের চরিত্রসমূহ যেন কোনোভাবেই পাশ্চাত্য ভাবধারা লালন না করে, এটাও তাঁদের বিবেচনা ছিল। তাই নারী-স্বাধীনতারও একটি নির্দিষ্ট এবং ভারতীয় মাত্রা ছিল তাঁদের কাছে।

সবুজপত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ছোটগল্প প্রকাশিত হতে থাকে নিয়মিতভাবে এবং সে-সূত্রেই পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২১ সংখ্যায় প্রকাশ পায় রবীন্দ্রগল্প 'স্ত্রীর পত্র'। এই গল্পে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাকে ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের সূত্রে *নারায়ণ* পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশ করা হয় আর একটি গল্প; শিরোনাম— 'মৃণালের কথা'। 'মৃণালের কথা'য় রচয়িতার নাম মুদ্রিত হয় নি। আগে সাময়িকপত্রের ষান্মাষিক বা বার্ষিক সূচিপত্র প্রকাশ করা হতো। *নারায়ণ* পত্রিকার বার্ষিক সূচিপত্র অনুসন্ধান করে দেখা যায়, সেখানে 'মৃণালের কথা'র লেখকের নাম মুদ্রিত আছে এবং তিনি এই পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ লেখক বিপিনচন্দ্র পাল। বিপিনচন্দ্র পাল জন্মেছিলেন সিলেটে। কলকাতায় তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকেই যুক্তিবাদী ছিলেন তিনি; পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করলে রাজনীতিতে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন বিপিনচন্দ্র পাল। যুক্তিবাদী অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন এই ধীমান। ইংরেজবিরোধিতা ছিল তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্মে। সে-সূত্রেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। *নারায়ণ* পত্রিকার অন্যতম প্রধান লেখকে পরিণত হয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিপিনচন্দ্র পাল উভয়েই ইংল্যান্ড থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আসেন। বিপিনচন্দ্র পাল অক্সফোর্ডে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অধ্যয়ন করেন আর চিত্তরঞ্জন দাশ মিডল টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। কিন্তু এ দুজনই চূড়ান্তমাত্রায় ব্রিটিশবিরোধী ছিলেন। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় কংগ্রেস দলের ব্রিটিশবিরোধী নীতি মনঃপূত না হওয়ায় চরম ব্রিটিশবিরোধী নীতি গ্রহণ করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেস ত্যাগ এবং 'স্বরাজ্য দল' (১৯২৩) নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জওহরলাল নেহেরুর পিতা মতিলাল নেহেরু। মুসলিম নেতাদের সঙ্গে করা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৯২৩) এবং কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রথম মেয়র হিসেবে চাকরিক্ষেত্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকারদান দেশববন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হিসেবে বিবেচিত। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং হিন্দু-মুসলিম মিলনপ্রয়াসী। কিন্তু এমন একজন অসাম্প্রদায়িক নেতা কর্তৃক সম্পাদিত সাময়িকপত্রের নাম *নারায়ণ* কেন? এ কি কোনো সম্প্রদায়গত নাম? এ ধরনের প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের 'সত্যাগ্রহ' শিরোনামের একটি লেখায়। ভারতবাসীর উদ্দেশে তিনি লিখেছেন :

> আবার বলি, উঠ, ডাক, জাগ,— আপনাকে জাগাও। সম্মুখে প্রেমের পথ সুবিস্তৃত, সেই পথের পথিক হইয়া জাতির কল্যাণকে জাগাও। তবেই 'নর-নারায়ণের' প্রকাশ হইবে। মনে করিও না, শুধু তোমার মধ্যে আর আমার মধ্যে নরনারায়ণের বিকাশ। সে অহঙ্কার একেবারে ছাড়িয়া দাও। যাহারা দেশের সারবস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, মাটি কর্ষণ করিয়া, আমাদের জন্য শস্য উৎপাদন করে,— যাহারা ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যেও মরিতে মরিতে দেশে সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে,— যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও দেশের ধর্ম্মকে অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে,— যাহারা আজিও শুদ্ধ চিত্তে, সরল প্রাণে, মর্ম্মে মর্ম্মে দেশের মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থনা করে,— যাহারা জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া, জাগাইয়া রাখিয়াছে,— যাহারা বাস্তবিক এদেশের একাধারে রক্ত মাংস ও প্রাণ,— 'উঠ, ডাক, জাগ'— তাঁহাদের মধ্যে 'নর-নারায়ণ' জাগ্রত হউক। এস নারায়ণ, এস নর-নারায়ণ— আমাদের হৃদয় প্রস্তুত কর। (মণীন্দ্র, ১৩৮৫: ১১)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মনে করতেন মানুষের মধ্যেই নারায়ণ বা ঈশ্বর আছেন, মানুষেই তিনি সদাবিরাজমান। তাই জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষই নারায়ণ বা ঈশ্বরের প্রতিরূপ ছিল তাঁর বিবেচনায়। 'নরনারায়ণ' দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের একটি স্লোগানে পরিণত হয়। সাময়িকপত্রের নামও তিনি সে-কারণে দিয়েছিলেন *নারায়ণ*। এই নামের মধ্যে স্বাদেশিকতাও আছে। সে সময় পাশ্চাত্যপ্রভাবিত যে কোনো কিছুরই বিরোধী ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং বিপিনচন্দ্র পাল। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এ পাশ্চাত্যধারায় নারী-স্বাধীনতা প্রকাশ পেয়েছে বলে সমকালে অনেকে মনে করেন। এই 'পাশ্চাত্যচিন্তা প্রভাবিত নারী-স্বাধীনতা'র বিরোধিতা করেছিলেন *নারায়ণ* পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ এবং বিপিনচন্দ্র পাল। তাই *নারায়ণ*-এর সূচনা-সংখ্যাতেই প্রকাশ করা হয়েছিল 'মৃণালের কথা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল সংসার ত্যাগ করেছিল এবং চিঠি সমাপ্ত করেছিল 'তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৮ : ৬৪৮) বলে। *নারায়ণ* পত্রিকায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের কথা'র মৃণাল সংসারে ফিরে আসার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে এবং চিঠি সমাপ্ত করেছে 'আমি তোমারই চিরদিনের চরণাশ্রিতা' (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৫৬) বলে। ফলে মৃণাল দুজনই; একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, অন্যজন চিত্তরঞ্জন-বিপিনচন্দ্র পালের। এ দুই মৃণাল ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের; শরৎচন্দ্রের মৃণাল বেশ পরের, ১৯২০-এর[২]।

খ.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' গল্প অনেক বাঙালি পাঠকেরই পড়া, গল্পের মূলচরিত্র মৃণালও তাদের পরিচিত নিশ্চয়ই। 'শ্রীচরণকমলেষু' দিয়ে চিঠির আদলে গল্পের সূচনা, পত্রলেখিকার নাম (মৃণাল) দিয়ে গল্পের শেষ। দীর্ঘ গল্প। পত্রলেখিকা মৃণাল তার স্বামীকে চিঠিটি লিখেছে। সে সংসারে 'মেজোবউ' বলে পরিচিত। বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে পনের বছর ধরে মেজোবউ সংসার করেছে। অর্থাৎ তার বয়স তখন সাতাশ। নিজের রূপ ও বুদ্ধি দুটোই খুব বেশি — এমন দাবি মৃণালের। আছে কবিতা লেখার অভ্যাস। নিজের পশুপ্রীতির উদাহরণ দিয়েছে সে। বড়ো জায়ের বোন বিন্দু নিজমাতার মৃত্যুর পর

নিকটাত্মীয়দের অত্যাচারে সংসারে থাকতে না পেরে মৃণালদের যৌথ পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করলে নিজস্বামীর অপছন্দের কারণে মৃণালের জা পর্যন্ত সহোদরাকে 'বিষম বালাই' বলে বিবেচনা করে। কৃষ্ণবর্ণের বিন্দুর পাশে দাঁড়ায় মৃণাল। বিন্দুকে কেন্দ্র করে এবং স্বীয় জীবনাভিজ্ঞতার আলোকে মৃণাল নারীজীবনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ এই গল্পে তুলে ধরেছে। শাস্ত্র, বিয়ে, রীতি ইত্যাদিকে সামনে রেখে নারীদের প্রতি সে সময়ের সমাজের যে আচরণ— এর অনেক কিছুকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে এই রবীন্দ্রগল্পে। অবশেষে খুড়িমার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র তীর্থগমনের নাম করে সংসারের বাইরে আসে মৃণাল। তীর্থে এসে মৃণাল স্বামীকে যে চিঠিটি লেখে, তাতে উল্লেখ আছে : 'কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৮ : ৬৪৭)। আত্মহত্যা নয়; সংসারে না-ফেরার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে মৃণাল চিঠি শেষ করে। এখানেই গল্প শেষ।

'স্ত্রীর পত্র' *গল্পগুচ্ছ*-এ পাওয়া যাবে। কিন্তু 'মৃণালের কথা' আজ আর সহজলভ্য নয়। এই গল্পের মাধ্যমে বাঙালি নারীদের গৃহত্যাগে প্ররোচনা প্রদান করে রবীন্দ্রনাথ শাশ্বত বাঙালি সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত হেনেছেন এবং পাশ্চাত্যরীতি প্রয়োগ করে নারীদের যুদ্ধংদেহী করে তুলেছেন বলে সমকালে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় *নারায়ণ* (অগ্রহায়ণ ১৩২১) পত্রিকায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্র পাল রচিত 'মৃণালের কথা' গল্পটি 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রতিবাদ এবং একটি লিখিত প্রতিক্রিয়া। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' একটিমাত্র চিঠি, কিন্তু 'মৃণালের কথা' ছোটবড় পনেরটি চিঠির সমন্বয়। চিঠিগুলো হচ্ছে :

প্রথম অধ্যায়
মৃণালের স্বামীর দিদির (বড় বোন) লেখা, মৃণালের স্বামীকে
দ্বিতীয় অধ্যায়
মৃণালের স্বামীর দিদির ঠাকুরপো নরেনের লেখা, মৃণালের স্বামীর দিদি অর্থাৎ তার বৌদিকে লেখা নয়টি চিঠি
তৃতীয় অধ্যায়
বিন্দুর চিঠি, মৃণালকে
চতুর্থ অধ্যায়
মৃণালের চিঠি, বিন্দুকে
পঞ্চম অধ্যায়
নরেনের লেখা চিঠি, মৃণালের স্বামীর দিদিকে অর্থাৎ নরেনের বৌদিকে
ষষ্ঠ অধ্যায়
মৃণালের স্বামীর দিদির লেখা চিঠি, মৃণালকে
সপ্তম অধ্যায়
মৃণালের চিঠি, স্বীয় স্বামীকে

রবীন্দ্রগল্পের একটি চিঠির বিপরীতে বিপিনচন্দ্র পালের পনেরটি চিঠি লিখে এতো আয়োজনের মূলকথা : মৃণাল সংসার ত্যাগ করে ভালো করে নি; সংসার ত্যাগ সমাধানের

পথ নয়; মৃণালকে সংসারে আবার ফিরিয়ে আনা। 'মৃণালের কথা'য় প্রথমে বলা হয়েছিল চিঠিটি মৃণালের নয়, এটি আসলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই প্রভাবে কোনো পুরুষের লেখা। প্রথম অধ্যায়ের চিঠিতে বলা হয়েছে :

> আমার সন্দেহ হয়, এ চিঠিটা সত্যি সত্যি মেজবউর লেখা কি না। তার যে ভাইটার[৩] কথা লিখিছে, তাকে ত তুমি বেশ জান। শুনছি সে নাকি একজন ভারি লিখিয়ে হয়ে উঠছে। শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতা পায় দেয়, চুড়িদার জামা পরে, আর কবিদের মতন বাবরী চুল রেখেছে। শুনেছি রবিঠাকুরের সঙ্গেও নাকি খুবই জানাশুনা আছে। তাঁর নামসহি ছবি পর্য্যন্ত বাক্সে আছে, বন্ধুবান্ধবদের দেখিয়ে বেড়ায়। সেই হয়তো এ চিঠিটা লিখে দিয়েছে। লেখার খুব বাহাদুরি আছে, উনি পড়ে বলেন যে ঠিক যেন রবি ঠাকুরেরই মতন। [...] [...] [...] হিন্দুঘরের মেয়ে, যতই জ্যাঠা হোক না কেন, অমন চিঠি লিখতে পারে না। (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ২০-২১)

রবীন্দ্রনাথের মৃণালের চিঠিটি কোনো বাঙালি নারীর নয় বরং এটি 'আগাগোড়া যেন ইংরেজির তর্জমা' বলে অভিহিত করা হয়েছে বিপিনচন্দ্র পালের গল্পে। পাশ্চাত্য, বিশেষ করে ব্রিটিশ নারীর কথা বলানো হয়েছে বাঙালি মৃণালের মুখ দিয়ে — এমন বক্তব্য 'মৃণালের কথা'র গল্পকারের। ব্যঙ্গও করা হয়েছে : মৃণালের এই মনোভাব 'হিস্টিরিয়া'র লক্ষণ।

'মৃণালের কথা' গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূলকথা : মৃণাল তীর্থক্ষেত্র পুরীতে অবস্থানকালে কী করছে, তার মনের অবস্থা কী? মৃণালকে নজরদারিতে রাখে মৃণালের স্বামীর বড় বোনের ঠাকুরপো নরেন, যাকে মৃণাল চেনে না। এই 'ঠাকুরপো' নরেন মৃণালের প্রাত্যহিক কর্ম ও আচরণ লিখে জানায় তারই বৌদি অর্থাৎ মৃণালের স্বামীর দিদিকে। প্রথম চিঠিতে আছে : মৃণাল যে খুড়িমার সঙ্গে তীর্থক্ষেত্র পুরী এসেছিল সেই খুড়িমা তীর্থশেষে বাড়ি ফিরে গেছে কিন্তু মৃণাল সেখানেই থেকে যায়। মৃণাল স্বর্গদ্বার নামক স্থানে অবস্থানগ্রহণ করে এবং প্রতি দিন নিয়ম করে সমুদ্রদর্শনে বের হয়। দ্বিতীয় চিঠিতে আছে : মৃণালের ভাই শরৎ আর নরেন পূর্বপরিচিত বিধায় শরতের আগ্রহে নরেন পুরীর স্বর্গদ্বারের ভাড়া বাসায় অবস্থানগ্রহণ করে এবং মৃণালকে দিদি বলে ডাকে। মৃণালও ভাইয়ের বন্ধু নরেনকে ভাই বলেই মনে করে। এই চিঠির বর্ণনা মতো নরেন মৃণালকে কাছে থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পায়। সে-সূত্রে নরেন বর্ণনা করে যে, মৃণাল 'যখন যেখানে মিষ্টি কথা পান, তাই টুকে রাখেন'। নরেনের কথা : 'আমায় [নরেনকে মৃণাল] বলেছিলেন এতে কবিতা লেখার নাকি খুব সুবিধা হয়।' (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ২৯)। এই চিঠিতে মৃণালের কবিস্বভাবকে উপহাস করা হয়েছে এভাবে : 'আমিও এখন থেকে খাতা হাতে করে সব বই পড়ি। দেখ কি তোমার মেজবউয়ের কল্যাণে হয় ত তোমার এই ঠাকুরপোও ক্রমে একটি কবি হয়ে উঠবে।' (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ২৯)। তৃতীয় চিঠিতে আছে : মৃণালের সঙ্গে নরেন বেড়াতে গেছে। সেখানে একটি আমগাছ দেখে মৃণাল বলছে : 'দেখেছ নরেন, ঐ গাবগাছে কেমন লাল লাল পাতা বেরিয়েছে?' (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৩০)। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এ গাবগাছ-প্রসঙ্গ আছে। আমগাছকে মৃণাল গাবগাছ বলার পরও নরেন মৃণালের কথাই মেনে নেয়। বিপিনচন্দ্র পালের টিপ্পনিটা এমন :

বেগতিক দেখে বললাম [নরেন মৃণালকে বললো], 'তুমি যখন বল্‌ছ, তখন গাবই বা হবে।'
'গাবই বা হবে কেন, গাবই নিশ্চয়। ওটা যদি গাব না হয় তবে কবির দৃষ্টি কি মিথ্যা হবে?'
আমি বলাম— 'কখনওই হতে পারে না। বিধাতা যে কবির চোখেই তাঁর জগতকে দেখেন। তিনিও ত কবি।'
এতগুলি ধর্ম্মকথা বলে তবে প্রাণে বাঁচলাম। এবার থেকে তোমার মেজবউ যখন যা বলবে, তাতেই হুঁ দিয়ে যাব। (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৩১)

চতুর্থ চিঠিতে আছে : নরেন এক মাস ধরে মৃণালকে পর্যবেক্ষণ করে জানাচ্ছে, 'বাহিরে তার [মৃণালের] যতই কবিতা গজাক না কেন, ভিতরটা ঠিক আছে।' (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৩২)। তবে এ সময় মিস্টার মৈত্র বলে একজনের সঙ্গে মৃণালের পরিচয় ঘটে, যে কিনা ইংরেজি-বাংলা কবিতার বাগাড়ম্বরে মুগ্ধ করে মৃণালকে। পঞ্চম চিঠিতে মিস্টার মৈত্রের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। সে ব্রাউনিঙের কবিতার 'স্বরচিত অনুবাদ' করে মৃণালকে শোনায়, যে শোনানোর মধ্যে মৃণালের হৃদয়জয়ের বাসনা থাকে। মৃণালও মিস্টার মৈত্রের ফাঁদে পা বাড়ায়। ব্রাউনিং অনুসরণে মিস্টার মৈত্র রচিত কবিতা পড়ে মৃণালের মনোভাব এমন :

আর সব চাইতে এর বাহাদুরী এই যে তোমার মেজবউকে এ কবিতাটায় একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তিনি বারবার এসে আমায় বলছেন 'দেখ নরেন, দেখ, দেখ, কি সুন্দর শুনাচ্ছে—

দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পরাণ-ডোর—
ওগো সুন্দর মোর!

লেখার কি ভঙ্গি, ভাবের কি গভীরতা। বাংলায় এক রবি ঠাকুর ছাড়া আর কেউ অমন লিখতে পারে না। তুমি ত ব্রাউনীং পড়েছ, ব্রাউনীং সত্যি কি এত মিষ্টি। (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৩৬-৩৭)

ষষ্ঠ পত্রে আছে : মিস্টার মৈত্র মৃণালের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে তাকে দূরবর্তী সমুদ্রতীরে নিয়ে যায়। নরেন লিখেছে : 'আর সন্ধ্যাবেলা সে অতি নিরালা স্থান। আমিও ঐ দিকেই বালি ভেঙ্গে ছুটলাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রতীর জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। সারকিট হাউজ ছাড়িয়ে দেখলাম, আর কোথাও কেউ নাই। হঠাৎ যেন একটা অস্ফুট চীৎকার কানে গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, ঐ লোকটা তোমার মেজবউকে অপমান করবার চেষ্টা কচ্ছে। আমি এক লাফে তার উপরে পড়ে তোমার মেজবউকে ছাড়িয়ে নিয়ে, তার গলার চাদর কষে ধরে, পায়ের জুতা খুলে, গায়ে যত জোর ছিল তাই দিয়ে বেটাকে পিটুতে আরম্ভ কররাম।' (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৩৮-৩৯)। এই ঘটনার পর, ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায়, ভয়ে, অনুতাপে মৃণাল অসুস্থ হয়ে পড়ে। সপ্তম পত্রে আছে : মৃণালের ছোট ভাই শরৎ কয়েক দিনের জন্য পুরীর বাইরে ছিল। সে পুরীতে ফিরেছে তবে মৃণালের ঘটনা তাকে জানানো হয় নি। অষ্টম পত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রে মৃণাল ও নরেনের কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত মৃণাল নরেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এভাবে :

''তখন আমাকে [নরেনকে] কাছে ডেকে, বিছানায় বসিয়ে, আমার হাতখানা ধরে বলেন [মৃণাল]— 'নরেন, তুমি আমার সত্য ভাইএর কাজ করেছ, তুমি না থাকলে সেদিন আমার কি হতো জানি না। প্রথম দিন থেকেই আমি যে চোখে শরৎকে দেখতাম, সেই চক্ষে তোমায়

দেখেছি। তাই শরৎ যখন কলকাতায় যেতে চাইলে, কোনও আপত্তি করি নাই। শরৎ আমার জন্য যা করতে পারত না, তুমি তাই করেছ, এ ঋণ জন্মে শোধ দিতে পারব না।" (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৪০)

দ্বিতীয়ত, এ প্রসঙ্গেই আসে মৃণালের গৃহত্যাগের কথা। মৃণাল নরেনকে জানায় যে সে শুধু গৃহই নয়, স্বামীকেও ত্যাগ করেছে। এবার নরেন বোঝায় মৃণালকে :

নরেন তুই আমায় ভালবাসিস বলে ওসব বলছিস। তুই জানিস না, আমি কি করেছি। আমি তাঁকে [স্বামীকে] ত্যাগ করেছি।'
আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম। 'ত্যাগ করেছ কি করে? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ডাইভোর্স নাই তা কি জান না।'
'ডাইভোর্স কি রে?'
'মুসলমানরা যাকে তালাক বলে, ইংরেজরা তাকেই ডাইভোর্স বলে। হিন্দুর স্ত্রী যে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।'
'কিন্তু আমি ত করেছি তাই।'
'করেছ কি, খুলেই বল না, দেখি।'
'ওঁকে লিখেছি, আমি আর ওঁর স্ত্রী নই।'
'ঐ কথা! সব স্ত্রীই ত রাগ করে ওকথা বলে।'
'ঝগড়ার মুখে ও কথা বলি নি, কোনো দিন ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় নি। তাই বুঝি ছিল ভাল।'
'তবে কি করেছ?'
'আমি তাঁকে শান্তভাবে, ঠাণ্ডা হয়ে চিঠি লিখেছি যে আমি তাঁর স্ত্রী নই।'
'আবার একটা বে করতে বল নি ত?'
'তা বলতে যাব কেন? তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি করবেন। সে দায় আমার নয়।'
'ঐ দেখ, তুমি তাঁকে ছাড় নি; ছাড়লে তাঁর বিয়ের কথায় অমন হয়ে ওঠ কেন?'
'না নরেন, সত্যি আমি তাঁকে ছেড়েছি।'
'তিনিও কি তোমায় ছেড়েছেন?'
'তাঁর ছাড়ার অপেক্ষা ত আমি রাখি নি।'
'তবে তিনি যদি না ছাড়েন।'
'তাও কি হয়, আমি যে তাঁকে ছেড়েছি।'
'স্বামী স্ত্রীতে অত সহজে ছাড়াছাড়ি হয় না, দিদি। যে দেশে মাজিষ্টরের কাছে রেজিষ্টারী করে বিয়ে হয়, সে দেশে আবার মাজিষ্টরের কাছে গিয়ে রেজিষ্টারী থেকে নিজেদের নাম খারিজ করতেও বা পারে। হিন্দু তা পারে না। জান না দিদি, সাত পাক ঘুরে যে বে হয, চৌদ্দ পাকেও তা খোলে না।" (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৪১-৪২)

এই অধ্যায়ের নবম পত্রে জানানো হচ্ছে : রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে বিন্দুর মরণের যে কথা বলা হয়েছে তা আসলে সত্য নয়, বিন্দু মরে নি। সবটাই গুজব। বিন্দুর পাশের বাড়ির এক নবপরিণীতা কাপড়ে আগুন লেগে মরে, তারও নাম ছিল বিন্দু। দুই বিন্দুতে গুজব রটে। রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিন্দু সুখে আছে। আর বিন্দু যে সংসারে খানিকটা 'গোল' বাধিয়ে তুলেছিল, সেটাও নাকি মৃণালের প্রভাবেই। বিপিনচন্দ্র পালের গল্পে বিন্দু-প্রসঙ্গের সমাধান করা হয়েছে এভাবে : 'বিন্দু কেবল মরে নি, তা নয়, এখন অতি সুখে আছে। তোমার মেজবউকে [মৃণালকে] সে যে চিঠি লিখেছে, সেখানা নকল করে দিলাম, পড়ে দেখ। রাগ করো না,

বউদিদি, বিন্দু যে প্রথমে অতটা গোল বাধিয়ে তুলেছিল, তা তোমার মেজবউয়ের শিক্ষারই গুণে, তার নিজের স্বভাব দোষে নয়। তোমার মেজবউ নিজে এখন এটা বুঝেছেন, নইলে আমি ওকথা কইতাম না। বিন্দু সর্ব্বদাই নিজেকে বড় নিষ্পীড়িত মনে করত। তোমার মেজবউই এভাবটা তার প্রাণে বেশী করে জাগিয়ে দেয়। আর সে সর্ব্বদাই নির্য্যাতিত ও নিষ্পীড়িত ভাবে, তার দ্রোহিতা অবশ্যম্ভাবী।' (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৪৫)। গল্পের তৃতীয় অধ্যায়ে মৃণালকে লেখা বিন্দুর দীর্ঘ চিঠি তুলে ধরা হয়। এতে বিন্দু লেখে কীভাবে তার ও তার স্বামী সম্পর্কে মিথ্যে রটনা হয়েছে। সে আসলে খুব সুখে আছে: 'সুখ আমার উপচে পড়ছে।' মৃণালের প্রতি বিন্দুর অনুরোধ : 'শুনলাম আমি মরেছি শুনে তুমি বিবাগী হয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে গেছ। আমি যখন সত্যি সত্যি বেঁচে আছি, তখন তুমি আর ঘরবাড়ী ছেড়ে থাকবে কেন? আর মরেই কি কখনও তোমার দুঃখে আমার সুখ হতো? স্বামীর কোলে মাথা রাখতে যে কি সুখ, তা ত তুমি জান। তুমি আমার জন্য এই স্বর্গসুখও ছেড়েছ, শুনে অবধি আমার নিজের সুখ যেন আধখানা হয়ে গেছে। তুমি শিগ্‌গির ফিরে এস। আমার কোটী কোটী প্রণাম জানিবে। তোমারই সেবিকা— বিন্দু।' (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৫১)। চতুর্থ অধ্যায়ে আছে, বিন্দুর এই চিঠি পেয়ে মৃণালের আর একটু বোধোদয় ঘটে। সে বিন্দুকে লেখে : 'আমাকে তোমরা ওখানে যেতে বলছ। আমি কি করেছি তা জানলে এ পোড়ারমুখীর মুখ আর দেখতে চাইতে না। অমন দেবতার মতন স্বামী, তাঁকে কতই না অনাদর, কতই না অপমান করেছি। শাস্ত্রে আমি পরিত্যক্তা। কারণ অপ্রিয়ভাষিণী স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করবে, শাস্ত্রে এই কথাই বলে। [...] [...] [...] ঠাকুর-ঝি, তোমরা সতী সাধ্বী, আমি যে তোমাদের অস্পৃশ্যা। আমায় মাপ কর। আমি তোমাদের কাছে এ মুখ দেখাতে পারব না।' (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৫২)। সমাজ, সংসার, ধর্ম, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যবিষয়ে বিভিন্নজনের কাছ থেকে 'জ্ঞান' আর পত্রের মাধ্যমে অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মৃণাল সিদ্ধান্ত নেয় শ্রীক্ষেত্র পুরী থেকে সে আবার তার সংসারে ফিরে যাবে। এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করে সে তার স্বামীকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখে, এটিই 'মৃণালের কথা'র শেষ পত্র। এই পত্রে মৃণাল আত্মসমালোচনা করে তার স্বামীকে যে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো লেখে তা হচ্ছে :

১. পনের বছর স্বামীর ঘর করলেও স্বামীর মুখের দিকে সে তাকায় নি, শুধু নিজেকে নিয়ে থেকেছে। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির বড়াই, ভোগবিলাস, আর অসম্ভব কল্পনা করেই তার কেটেছে। কিন্তু তার স্বামী নীরবে সব সহ্য করেছে।

২. লোকে মৃণালের রূপের প্রশংসা করতো, মা-বাবা করতো বুদ্ধির প্রশংসা । এতে মৃণালের গর্বের শেষ ছিল না। স্বামী কিশোরী মৃণালকে শিখালো লেখাপড়া। কিন্তু এই লেখাপড়ার গর্বে মৃণাল স্বামীকে অবজ্ঞা করতে শিখলো। অথচ স্বামী মৃণালকে এক দিন একটি কটুকথা পর্যন্ত বলে নি।

৩. মৃণাল সব সময় স্বামী থেকে নিজেকে আলাদা করে ভেবেছে। শুধু আলাদা নয় বড় করেও ভেবেছে। এই কুভাবনার জন্য বিবাহিত পনের বছর তার নষ্ট হয়েছে, বাকি জীবনও নষ্ট হতে যাচ্ছিল।

৪. স্বামী ছাড়া স্ত্রী অরক্ষিত। পুরীতে মিস্টার মৈত্র যে অঘটন ঘটাতে যাচ্ছিল তা সংসার ত্যাগ করে মৃণালের অন্যত্র একাকি আসার কারণেই সম্ভব হয়েছে। অরক্ষিতা স্ত্রীর অঙ্গ পরপুরুষ স্পর্শ করলে স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ করে না, স্বয়ং রামচন্দ্রও করতে চান নি। মৃণালের স্বামী যদি মৃণালকে গ্রহণ করে তবে তা মহৎ কর্ম হবে।

এই চিঠির শেষ অনুচ্ছেদটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এর ভাষা হুবহু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন :

> বড় সাধ হয়েছে এবার যদি তুমি এ কলঙ্কিনীকে আবার চরণাশ্রয় দাও তবে তোমার মধ্যে ও তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে এ নারী-জন্মটা সার্থক করি। বিন্দি আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। সে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া সত্যকে পেয়েছে। আর আমি নিজেকে নষ্ট করতে বসে সত্যকে দেখেছি। তুমি আমায় রাখ বা ছাড়, যাই করা না কেন, আমি তোমারই চিরদিনের চরণাশ্রিতা— মৃণাল। (চিত্তরঞ্জন, ১৩২১ : ৫৬)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের মধ্যে রূপ ও বুদ্ধির সমাহার দেখিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের কথা'র মৃণাল অনুধাবন করে এই রূপ আর বুদ্ধি তাকে অর্থাৎ নারীকে অহংকারী করে তোলে। এমন কি যে স্বামী তাকে লেখাপড়া করিয়ে শিক্ষিত করে তোলে তাকেও অবজ্ঞা করতে শেখায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃণাল কবিতা লিখতে পারে। বিপিনচন্দ্র পালের মৃণালের মধ্যে দেখা গেছে এই কাব্যপ্রীতি তাকে অর্থাৎ নারীকে অতিআবেগী ও বাস্তববুদ্ধিহীন করে তোলে। তাছাড়া যে নারী রবীন্দ্রনাথের ভক্ত তার পরিণতি তাঁর মৃণালের মতো অর্থাৎ সংসারদ্বেষী হওয়াই স্বাভাবিক। নারী, বিশেষত স্ত্রী যে স্বামী ছাড়া অরক্ষিত বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর মৃণাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যে মৃণালকে সংসারের বাইরে ঠেলে দিলেন তাকে রক্ষা করবে কে? তাকে রক্ষা করার জন্য পুরুষের (এক্ষেত্রে নরেন) প্রয়োজন হয়। আর সে পুরুষটি যদি হয় স্বামী তাহলে তো কথাই নেই। বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের কথা'র খুবই বুদ্ধিদীপ্ত অংশ বিন্দুকে বাঁচিয়ে আনা। অনেকটা নাটকীয়ভাবে বিপিনচন্দ্র পাল উত্থাপন করেন, বিন্দু মরে নি, সে স্বামীর সংসারে সুখেই আছে। বিন্দুর বিয়ে ও পাগল স্বামীর যে পরিপ্রেক্ষিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে অবতারণা করেছিলেন এবং মূলত যে কারণে তাঁর মৃণাল সংসারের প্রতি আর একটু বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, বিপিনচন্দ্র পাল 'মৃণালের কথা'য় দেখালেন সেগুলো মোটেও সত্য নয়— গুজব। বরং বিন্দুর স্বামী অনেক মহৎ। সে রূপবান, কালো জেনেই যৌতুক না নিয়ে সে বিন্দুকে বিয়ে করেছে। বাসররাতে স্ত্রীর অঙ্গে নিজের গড়া গয়নাগুলো কেন পরানো হয় নি, পর দিন কেন স্ত্রীকে কাঁসার বদলে পিতলের থালায় ভাত খেতে দেওয়া হয়েছে— এসব কারণে রুষ্ট হয়ে তার স্বামী হাঙ্গামা করে। বিন্দু ভেবেছে তার স্বামী পাগল। আসলে সে পাগল নয়, বরং সে স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু খানিকটা রাগী। বিয়ের প্রথম প্রথম বিন্দু স্বামী সম্পর্কে এসব ভুল ধারণা নিয়ে তার ঘর ছেড়ে এসেছিল। আর সে তো মরে নি, মরেছে তারই পাশের বাড়ির আর এক বধূ, তারও নাম বিন্দু।

গ.

মৃণালের সংসার ত্যাগ করে সুখ নেই, নিরাপত্তাও নেই। রবীন্দ্রনাথ মৃণালকে দিয়ে যা করালেন তা নারীর জন্য আপদ বয়ে আনবে, সমাজ-সংসারের সুস্থিতির জন্যও তা প্রত্যাশিত নয়। চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পালেরা এমনই ভেবেছিলেন। তাঁরা একথা ভেবেছিলেন স্বদেশী-সংস্কৃতির নামে, একটা আদর্শবোধ থেকে। তাই এক মৃণালের বিপরীতে দাঁড় করানো হলো আর এক মৃণালকে। রবীন্দ্রনাথের মৃণালের গল্প যেখানে শেষ

চিত্তরঞ্জন-বিপিনচন্দ্র পালদের মৃণালের গল্প সেখানে শুরু; রবীন্দ্রনাথের মৃণাল যেখানে স্বামীর 'চরণতলে'র আশ্রয় ছিন্ন করে নিজের জগৎ নির্মাণের দিকে এগোয়, সেখানে চিত্তরঞ্জন-বিপিনচন্দ্র পালদের মৃণাল আবার ফিরে আসে স্বামীর সংসারে, 'চিরদিনের চরণাশ্রিতা' বলে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজে। একে আমরা 'রবীন্দ্র-বিতর্ক' বলে শিরোনামযুক্ত করছি বটে, আসলে এটি ব্যাপক অর্থে 'বিতর্ক' নয়, 'দ্বন্দ্ব'। নারীর জীবন, জগৎ, স্বাধীনতা, প্রত্যাশা ইত্যাদি নিয়ে দ্বন্দ্বটি ওই সমাজে ছিল — দুই মৃণালে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। নারী-স্বাধীনতা প্রশ্নে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার এই দ্বন্দ্ব কি আজকের সমাজেও বিরাজমান নয়? আবার স্মরণ করা প্রয়োজন, 'মৃণালের কথা' প্রকাশিত হয়েছিল ব্যক্তি-জীবনে অসাম্প্রদায়িক, রাজনীতিতে সমন্বয়বাদী, সাময়িকী সম্পাদনায় উদার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত সাময়িকী *নারায়ণ*-এ, গল্পটি লিখেছিলেন ব্রিটিশবিরোধী, বাগ্মী ও বিদ্বান বিপিনচন্দ্র পাল। তবে কি নারী-স্বাধীনতার প্রশ্নে সংস্কার ও রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না অনেক দেশপ্রেমিক, বিদ্বান, মুক্তমনা বলে পরিচিত ব্যক্তি? তাঁরা এসব করে থাকেন স্বদেশী-সংস্কৃতি আর আদর্শবোধের নামে? রচনা ও প্রকাশের প্রায় একশ বছর[৪] পর 'স্ত্রীর পত্র' গল্পপাঠের পাশাপাশি 'মৃণালের কথা' পাঠ ও আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এখানেই।

টীকা

১. গত শতাব্দীর প্রধান সাময়িকপত্রগুলোর একটি বৈশিষ্ট্য হলো— প্রকাশিত সংখ্যাগুলোতে পৃষ্ঠাঙ্ক ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা। যেমন, প্রথম সংখ্যা যদি ১০৮ পৃষ্ঠায় শেষ হয় দ্বিতীয় সংখ্যা তাহলে ১০৯ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ হবে; দ্বিতীয় সংখ্যা যদি ২১২ পৃষ্ঠায় শেষ হয় তৃতীয় সংখ্যা তাহলে ২১৩ পৃষ্ঠা থেকে আরম্ভ হবে। আর এক বছর পর, বছরের শেষ সংখ্যায় প্রথম থেকে শেষ সংখ্যার একটি ধারাবাহিক সূচিপত্র মুদ্রিত হতো। এটি করা হতো এক বছরের সাময়িকী একত্র বাঁধিয়ে রাখার সুবিধার জন্য। কোনো কোনো সাময়িকপত্রিকায় ষান্মাসিক সূচিপত্রও ছাপা হতে দেখা গেছে।

২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস *গৃহদাহ* প্রকাশিত হয় ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে।

৩. 'আমার ছোটো ভাই শরৎ কলকাতায় কলেজে পড়ছিল;' 'স্ত্রীর পত্র', (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৮ : ৬৪৫)

৪. এখন থেকে ৯৮ বছর আগে (১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে) গল্প দুটি রচিত।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৯২। *রবীন্দ্রজীবনী*, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।

বিষ্ণু বসু ও তীর্থপতি দত্ত (সম্পাদক), ১৯৮৭। *মধুসূদন-দীনবন্ধু রচনাবলি*, তুলি-কলম প্রকাশনী, কলকাতা।

মণীন্দ্র দত্ত ও হারাধন দত্ত (সম্পাদক), ১৩৮৫। *দেশবন্ধু রচনাসমগ্র*, তুলি-কলম প্রকাশনী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৯৮। *গল্পগুচ্ছ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৮৪। *শেষসপ্তক*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৯। *শ্রেষ্ঠ উপন্যাস*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

সাময়িকপত্র

চিত্তরঞ্জন দাশ (সম্পাদক)। ১৩২১, *নারায়ণ*, ১৪৮ নম্বর রসা রোড, কালিঘাট, কলকাতা।